দৈনিক জনকণ্ঠ 40

তারিখ AUG 0-1 1999
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

বিতর্ক

ডবল শিফট স্কুলে

ডবল শিফট স্কুল বলতে বোঝায় একই অবকাঠামোর ভিতরে একই প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ভিন্ন শিক্ষক-কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত একটি পরিপূর্ণ বিদ্যালয় যার হিসাব-নিকাশও আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ভিন্ন এক শ্রেণীর কর্মচারী দ্বারা।

সরকারী স্কুলের নিয়মানুযায়ী প্রতি শাখায় কাম্য ছাত্রসংখ্যা ৫০ থেকে ৬০ জন। ছাত্রভর্তির চাপ ক্রমান্বয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে এখন প্রতি শাখায় ৭০/৮০ জন। সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে এত ছাত্র ভর্তির চাপ যে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও এলাকাভিত্তিক চাপ বর্তমানে প্রধানগণকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এ চাপের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই। প্রধানগণ কোনভাবেই নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না। আবার অতিরিক্ত চাপের ফলে দু'কুল বজায় রাখতে গিয়ে প্রধানগণ অনেকেই মানইজ্জত হারাচ্ছেন বা হারিয়েছেন। এমনকি অসময়ে অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানে বদলির শিকারও হচ্ছেন।

এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যেই সরকার একই বিদ্যালয় ভবনে একটি সম্পূর্ণ আলাদা বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করে। পরবর্তীতে সমসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়। এ স্কুলে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি না করেই "একের ভিতরে দুই" নীতিমালায় স্কুল চালু করা হয়। শুধুমাত্র একজন প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ একটি আলাদা স্কুলই যা। তাঁর তত্ত্বাবধানের মূল্যায়ন করা হয় মাত্র ২৫০ টাকা প্রতিমাসে পারিশ্রমিক হিসাবে। এটি একটি হাস্যস্পদ ব্যাপার। এর ফলে দেশবাসী যা পাচ্ছেন তা হলো বেকার সমস্যা ও ছাত্রভর্তির চাপের আপাতত একটি সমাধান। অভিভাবকগণ তো বুঝতেই পারলেন তাঁদের ছেলেমেয়ের ভর্তির সমস্যা সমাধান হয়েই গেল। সরকার ও জনগণের প্রত্যাশা, এ স্কুলগুলোতে উন্নতমানের পড়ালেখা হবে। কিন্তু বাস্তবদৃষ্টিতে পড়ালেখা না হয়ে তা ক্রমাবনতি ঘটছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি কখন খুতিয়ে দেখছে যে, এ 'ডবল শিফট' স্কুলগুলোতে পড়াশোনা হচ্ছে না কি? এখন দেখা যাক কিভাবে পড়ালেখা ব্যাহত হচ্ছে।

স্বাভাবিক নিয়মে একটি স্কুল সকাল ১০-৩০ টায় শুরু হয়ে তা ১৬-৩০টা পর্যন্ত চলে। এতে বিরতি ৪০ মিনিট বাদ দিয়ে প্রায় প্রত্যেক ঘণ্টার ব্যাপ্তিকাল থাকে ৪০ মিনিট। "ডবল শিলট" স্কুলগুলোতে প্রভাতী শাখায় শিক্ষাদান হয়ে থাকে সকাল ০৭-৩০টা থেকে ১১-৩০টা পর্যন্ত এবং দিবাশাখা চলে ১২টা থেকে ১৬-৩০টা পর্যন্ত। বোঝাই যাচ্ছে যে, এখানে প্রত্যেক ঘণ্টার ব্যাপ্তিকাল হচ্ছে ৩৩ মিনিট থেকে ৩৫ মিনিট। মধ্যাহ্ন বিরতি মাত্র ২ বিরতিতে ছাত্র-শিক্ষক কেউই হালকা নাস্তা গ্রহণে না। এমনকি জোহরের নামাজও পড়তে পারছেন অনেকেই মধ্যাহ্ন বিরতিতে মধ্যাহ্নভোজ সেরে ব্যাহত হচ্ছে। স্কুলগুলোর প্রত্যেক শ্রেণী ছাত্রসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ছাত্র। উভয় শাখায় এ ৩৫ মিনিটের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকা আসা-যাওয়াতে ৩ মিনিট। তাহলে এ ৩২ মিনিটে ৭০/৮০ ছাত্রকে পড়াশোনা বুঝিয়ে দেয়া এবং নেয়া কি সম্ভব? এ কারণে শিক্ষকগণ বাড়িতে এবং তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

আবার বর্তমানে সৃষ্ট প্রভাতী প্রাথমিক এবং দি পরিবেষ্টিত স্কুলে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ফলে জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষকগণ স প্রাথমিক শাখায় পড়িয়ে আসছেন। তাঁরা ম পাঠদানের কোন সুযোগ পাচ্ছেন না। অপরপক্ষে

...ন পিন্টু

বিনিয়োগ করে একটি
কমপক্ষে পাঁচ হাজার
হজ উপায় আর কি
লাগালে ফল খেয়ে তৃপ্তি
। অপরদিকে গাছের
লাগানোর পর প্রথম
হবে। এর জন্য কোন
দেখভাল করা,
ছাগলের হাত থেকে
পর প্রাকৃতিক নিয়মে
জ্বালানি সরবরাহ
ব, সর্বোপরি নির্মল বায়ু
বেশ রক্ষার জন্য।
আর গাছ। বৃক্ষরোপণ
প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি
গ্রামের রাস্তাঘাট, বাড়ির

াইল বা পতিত জায়গা
জ গাছ। মূলত আর্থিক
ক্ষ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে ঠিকই,
া হচ্ছে প্রচুর। অনেক
ার শিক্ষা বা বিয়ের খরচ
ন্তান বেড়ে ওঠার সঙ্গে
া বিক্রি করে মেয়ের
অর্থ যোগান দেবার প্রস্তুতি
করছে।
দের দেশে বৃক্ষরোপণের
। এ সময় আবহাওয়া ও
প্রাকৃতিক সেচ হিসাবে
শিকড় বের হবার জন্য
। তাই তো বর্ষা মৌসুমে
হিড়িক পড়ে গেছে।
ক হচ্ছে মেহগনি। এর কাঠ
, বেড়ে ওঠে তাড়াতাড়ি,
কারণে মেহগনি চারার
ক সাত টাকার মধ্যে
ন মেহগনি চারা
র একটু যত্ন নিলেই দশ
ওয়া যাবে অন্তত পাঁচ
খরচ করে এক শ' মেহগনি
গুলো কমপক্ষে পাঁচ লাখ
ছাড়াও অতি অল্প
হচ্ছে শিরীষ (আঞ্চলিক
ভাষায় মেগনিশ)। এই গাছ দীর্ঘ শাখা-প্রশাখা
করে। ফলে বেশ জায়গা নষ্ট হয়। কেউ কেউ
হিসাবে বছর বছর ডালপালা ছাঁটার জন্য এই গ
রোপণ করে। পরিপক্ব শিরীষ কাঠের চাহিদা ও
তুলনামূলক বেশি। এভাবে প্রতিটি ফলজ ও বন
বৃক্ষের আর্থিক মূল্য ছাড়াও রয়েছে নানা উপকা
চলতি বৃক্ষরোপণ মৌসুমে চারার দাম বেশ কম
বৃক্ষরোপণে মানুষের আগ্রহ সৃষ্টির পাশাপাশি চা
চাহিদা বেড়েছে। এই চাহিদা আঁচ করতে পেরে
কৃষক ও বেকার যুবকদের অনেকে প্রচুর চারা উ
করেছে। চারার উৎপাদন ও চাহিদা দু'টিই এবা
আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় চারার গ্রোথনেসও
হয়েছে। সবুজ, সতেজ চারাগাছে ভরে যাচ্ছে গ্রা
হাটবাজার।

কথা হয় শিক্ষিত বেকার যুবক সেখ আব্দুল আ
সঙ্গে। আলীম খুলনা বিএল কলেজে মাস্টার্সের
বাড়ি বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার বারা
গ্রামে। বাড়ির পাশে ফাঁকা জমিতে তিনি নার্সারি
তুলেছেন। ৭/৮ কাঠা জমিতে লাগিয়েছেন দশ
সহস্রাধিক মেহগনি চারা। সর্বসাকল্যে তার খর
সাত হাজার টাকা। চার থেকে সাত টাকা দরে
সহস্রাধিক চারা বিক্রি করে তার আয় হবে কম
হাজার টাকা। ইতোমধ্যে ৬/৭ হাজার চারা বিক্রি
হয়েছে। খুলনা-বাগেরহাট পুরনো সড়কের পাশে
দেখে পথিক এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে
আলীম বললেন, যেনতেন চাকরির চেয়ে জমি থ
নার্সারি করে বছরে ৫০ হাজার টাকা আয় করা
গ্রামের মানুষ পরিবেশ সম্পর্কে তেমন সচেতন
গ্রামগঞ্জে পরিবেশ দূষণও হয় কম। মূলত আর্থি
প্রয়োজনে পল্লীবাসী বৃক্ষরোপণ করলেও তা প
রক্ষায় বড় ধরনের অবদান রেখে চলছে। প্রাণধ
জন্য অনিবার্য দরকারী নির্মল বায়ুর অকৃপণদাতা
বৃক্ষ। আর তা রোপণ বা পরিচর্যার অর্থ প্রকৃত
নিজের তথা দেশবাসীর জন্য কিছু করা। বৃক্ষরে
বলা হয় ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের চেয়েও নিরাপদ
বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ মাত্র একবার, তাও
থেকে সর্বোচ্চ দশ টাকা। অবশ্য কিছু কিছু ফল
লাগাতে সর্বোচ্চ এক শ' টাকা বিনিয়োগ করতে
একটি গাছ লাগিয়ে কেউ জীবদ্দশায় সুফল না
ক্ষতি নেই। কারণ বংশধর তো থাকবেই। সন্ত
মঙ্গল কামনায় অভিভাবক সংগ্রাম করে জীবনভ
নিজের কথা বাদ দিলেও প্রাণপ্রিয় সন্তানের জন্য
মৌসুমে রোপণ করা যেতে পারে সাধ্যমতো ক
বনজ বা ফলজ বৃক্ষ।

কাশ্মীর, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ইন্দো
...প্রতিই মানুষের